বাকি ভারতের থেকে বাঙালির পুজোর ধরন পুরোপুরি আলাদা

রাম, হনুমান নয়, এটা শিব, বাসন্তী, ধর্মঠাকুরের মাস

জহর সরকার

১৪ এপ্রিল, ২০১৭, ০১:১২:২৯

চড়ক: চৈত্র সংক্রান্তির জনপ্রিয় শিবঠাকুরের গাজন স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে নাগরিক-সংস্কৃতিতেও। ছবি: দেশকল্যাণ চৌধুরী

রামের নামে যে অভূতপূর্ব আগ্রাসনের প্রদর্শনী দেখলাম, তাতে মনে হল, আমরা চৈত্র মাসে বাঙালির পূজিত চিরকালীন দেবদেবীদের ভুলে গিয়েছি। এই মাসটা শিব, শীতলা, অন্নপূর্ণা বা বাসন্তী এবং ধর্মঠাকুরের। এবং বাঙালিরা খুব নিশ্চিত যে দুর্গা বাড়ি আসেন আশ্বিনে, তা সে বোধন অকাল হোক আর না হোক। এ মাসে সবচেয়ে বর্ণময় উৎসব গাজন, অনেকে বেশ কিছু দিন ধরে শিব আর পার্বতী সেজে বেড়ায়, শিবের নাম করতে করতে। আমরা ধর্মকে এ ভাবেই পথে পথে নিয়ে যেতাম, ভক্তি ও নাচ-গান-মূকাভিনয়ের মাধ্যমে। তরোয়াল আর হুমকির মাধ্যমে নয়। উনিশ শতকের জাতিতাত্ত্বিকরা উত্তর ভারতে রামনবমী পালনের কথা লিখেছেন, কিন্তু বাংলায় নয়। এবং এটা খুব পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হবে, দুর্গার জয় উদযাপন আর রামের জন্ম উদযাপনের মধ্যে ফারাক আছে। দুটো ঐতিহ্য আলাদা, আশ্বিনের অকাল বোধনে

তাদের দেখা হয় মাত্র। বাঙালিরা একে পালন করে দুর্গার নামে, অন্যরা আশ্বিনের নবরাত্রি ও দশেরাকে পালন করে রামের নামে।

আমাদের এত মনসাতলা, ষষ্ঠীতলা, চণ্ডীতলা, ধর্মতলা, এমনকী রথতলা আছে, কিন্তু খুব বেশি 'হনুমানতলা' আছে, বা রামমন্দির? রামরাজাতলা রাম মন্দিরের মতো ব্যতিক্রম আছে, খুবই কম, আর বলা হয় এই মন্দিরটিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চৌধুরী পরিবার, যাঁরা আদতে এসেছিলেন উত্তর ভারত থেকে। বাঙালিরা সব সময় অন্য মত পোষণ করেছে, শুধু রাজনীতিতে নয়, সংস্কৃতি বা ধর্মেও। সারা ভারত পৌষ সংক্রান্তিতে ঘুড়ি ওড়ায়, কিন্তু বাঙালিরা ওড়ায় বিশ্বকর্মা পুজোয়। এবং শিবকে বাঙালিরা গ্রহণ করেছে তখন, যখন তিনি কৈলাস থেকে নেমে এসেছেন এক গামছা-জড়ানো দরিদ্র চাষি হিসেবে, যাঁকে স্ত্রী পার্বতী ঝাঁটা হাতে গোটা গ্রাম তাড়া করে বেড়ান। বাঙালিদের দুর্গার প্রতিমাও সারা ভারতের থেকে আলাদা, অন্য কোথাও যোদ্ধা-দেবীটিকে পুরো পরিবারসহ দেখা যায় না।

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, তুলসীদাসের রামায়ণ উত্তর ভারতকে অধিকার করার অনেক আগে, পঞ্চদশ শতাব্দীর কৃত্তিবাসী রামায়ণটি ভারতের অসামান্য বৈচিত্র ও বহুত্ববাদকে উদযাপন করেছে। এই ধারা শুরু হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীর তামিল কম্ব-রামায়ণম দিয়ে, তার পর এল তেলুগু শ্রী রঙ্গনাথ রামায়ণম, অসমিয়া কথা রামায়ণ, এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে কন্নড় ভাষায় একটি জৈন রামায়ণ। ষোড়শ শতাব্দীতে তুলসীদাসের মিষ্টি আওধি ভাষায় লেখা রামচরিতমানস প্রবল জনপ্রিয় হল এবং তার পর থেকে 'রামের পুজো উত্তর ভারতে খুবই প্রচলিত ছিল... রামের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত জায়গাগুলো ছিল পবিত্র তীর্থ, আর তাঁর জন্মদিন ছিল বিরাট উৎসবের দিন।' ১৯২১-এর এই রিপোর্ট থেকে বোঝা যায়, বাঙালিরা এই উৎসব, উপবাস এবং পবিত্র গ্রন্থপাঠের ঐতিহ্য থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে, কারণ রামচন্দ্র তাঁর মহাকাব্যিক যাত্রায় এই রাজ্য দিয়ে যাননি। তা হলেও, এতগুলো ভিন্ন রাম-ঐতিহ্য

আমাদের দেশের 'বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য'-এরই অসামান্য উদাহরণ।

১৯০৪ সালে, জন মার্ডক-এর বিখ্যাত 'হিন্দু ও মুসলিম উৎসব'-এ লেখা হল, বাংলায় চৈত্রের শুক্ল পক্ষের সপ্তম দিন থেকে দেবী বাসন্তীকে পুজো করা হয়, এবং 'এই হলুদবর্ণ দেবীটি শীতলাদের সাত বোনের তৃতীয় জন, যাঁদের ডাকা হত ভয়ানক অসুখ থেকে বাঁচতে।' সংস্কৃতায়নের পর তিনি পেলেন দুর্গার রূপ, তাঁর পুজো হত চৈত্রে, যদিও তা শারদীয়া দুর্গাপুজোর মতো 'সর্বজনীন ও আড়ম্বরপূর্ণ নয়।' প্রসঙ্গত, ষষ্ঠী, যাঁর পুজো হত ১২ চৈত্র, অশোক ষষ্ঠীর দিন, জনপ্রিয়তা হারালেন, কারণ উন্নত চিকিৎসা এল এবং শিশুমৃত্যুর হার কমে গেল।

শিব যে চৈত্রে রাজত্ব করেন বাংলা জুড়ে, রাঢ় বাংলায় লোক-দেবতা ধর্মকে সিংহাসন থেকে প্রায় হটিয়ে দিয়ে, সে গল্পটাও জটিল। বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদের কাজটা ছিল খুব কঠিন। পণ্ডিতসভা ছাড়া আর কোথাওই বৈদিক দেবদেবীদের খুব একটা কদর ছিল না, আর যে পৌরাণিক দেবদেবীদের নতুন করে ঢোকানো হল, তাঁরা পাল-রাজাদের সময় চার শতক ধরে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রতাপকেও ঠেকাতে পারলেন না, ইসলাম ধর্ম ঢুকে পড়ার পর ব্যক্তিত্বময় পিরদেরও মোকাবিলা করতে পারলেন না। আমজনতার দরবারে, শিব ও পার্বতী বার বার হেরে যেতেন স্থানীয় সর্পদেবী মনসার কাছে। কালকেতু ও ফুল্লরা শিকারি-থেকে-কৃষক হয়ে যাওয়া সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করত আর বাঙালি লোকদেবী চণ্ডীর আশীর্বাদ চাইত। এই প্রাচীন দেবীটি নিজের নাম বজায় রাখার জন্য এবং ব্রাহ্মণ্য চণ্ডীর থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বোঝাবার জন্য, গোড়ায় অনেক নাম জুড়ে নিতেন— বেটাই, পাগলা, শিবাই, খ্যাপা, ওলাই। ধর্ম বা ধর্মরাজ পশ্চিম অঞ্চলটায় চুটিয়ে রাজত্ব করতেন এবং তাঁর ভক্ত, স্থানীয় লোক-নায়ক লসেন, হারিয়ে দিত দুর্গা-উপাসক ইছাই ঘোষ-কে। যখন পণ্ডিত ব্রাহ্মণরা তাঁদের সংস্কৃত পুরাণ ও পরে উপ-পুরাণ দিয়ে মানুষকে কাছে টানতে পারলেন না, তখন মধ্য-বাংলায় গ্রামীণ পুরোহিতরা চ্যালেঞ্জটা নিলেন, চক্রবর্তী-

বাহিনী নেতৃত্ব দিলেন তাঁদের মঙ্গলকাব্য ব্যবহার করে—মুকুন্দরাম, রূপরাম, ঘনারাম ও খেলারাম। অবশ্যই এক-আধ জন বিজয় গুপ্ত বা পিপলাই ছিলেন, আর কয়েক জন দ্বিজ, কিন্তু প্রায় সব কবিই এলেন উঁচু জাত থেকে। তাঁরা নিম্নবর্গের দেবদেবীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে শুরু করলেন, এবং মন্দিরে বিগ্রহ পুজোর মতোই শাস্ত্রসম্মত হয়ে গেল পবিত্র ঝোপের ধারে পাথর পুজো। প্রসঙ্গত, গাছের নীচে টেরাকোটার হাতি-ঘোড়া রেখে মানত করার প্রথাটা দেখা যায় একেবারে দাক্ষিণাত্য থেকে পূর্ব অবধি, বোঝা যায়, একটা সাংস্কৃতিক উপ-স্তর একদম এক ভাবে ছড়িয়ে ছিল। ইসলাম ধর্ম যাঁরা নিয়েছিলেন, তাঁরাও অনেকে পিরের ঘোড়ার মাধ্যমে এ প্রথা বজায় রাখতেন।

এ ভাবেই শিব ঢুকে পড়েন, শিবায়ন পদ্যের মাধ্যমে, চাষির রূপ ধরে নতুন কৃষি-সমাজের কাছের লোক হয়ে যান: ‘ব্যাধে, গোপে, জেলে, তিন হইল হেলে!’ নাথ ও যোগীরাও মাটির-কাছাকাছি শৈবধর্ম চালু করেন। ভাবলে মজা লাগে, পুরনো কলকাতার যে মূল মোড়, সেখানে মিলেছিল চৌরঙ্গি, যার নাম এক নাথ-গুরুর নামে, আর ধর্মতলা, যেখানে আগে ছিল ধর্মঠাকুরের প্রাচীন মন্দির (এখন লোটাস সিনেমার কাছে স্থানান্তরিত)। এই শিবই শেষমেশ ধর্মঠাকুরের প্রচুর অনুষ্ঠান আত্মসাৎ করে নিলেন, গাজন ও চড়কও। তবে ধর্মঠাকুরের আচারগুলো হয় মূলত জ্যৈষ্ঠে, আর শিবের চৈত্রে, এরা মিলে যায় চৈত্র সংক্রান্তিতে। রাল্ফ নিকোলাস মেদিনীপুরে বহু দিন কাটিয়েছিলেন, তিনি লক্ষ করেন এই দুই ঠাকুরের পূজাবিধির আশ্চর্য সাদৃশ্য। চড়কের মূল আকর্ষণ ছিল পিঠে কাঁটা বিঁধিয়ে উঁচুতে দড়ি থেকে ঝোলা ও ঝাঁপ। এখন আইনবিরুদ্ধ, তবু ধর্মঠাকুরের অনেক ভক্তই আত্মনিগ্রহের আচার পালন করেন, জিভে গালে কাঁটাও বিঁধিয়ে রাখেন, আগুনে নাচেন। কিন্তু তাঁরা আর যা-ই হোক, ভগবানের নামে অস্ত্র চমকে অন্যদের ভয় দেখান না।